

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ২১

সূরা বাকারাহ ২৭৪-২৮১ আয়াত

সূরা বাকারাহ, কুরআনের সবচেয়ে দীর্ঘতম সূরা, আয়াত সংখ্যা ২৮৬, এটি সূরা ফাতিহার পর দ্বিতীয় ক্রমে এর অবস্থান। রেওয়ায়েত রয়েছে যে ইহা মদিনায় নাযিল হওয়া সর্বপ্রথম সূরা। রুকু সংখ্যা ৪০।

নামকরণ

বাকারাহ মানে গাভী। এ সূরার ৬৭ থেকে ৭৩ নম্বর আয়াত পর্যন্ত হযরত মুসা এর সময়কার বনি ইসরাইল এর গাভী কুরবানীর ঘটনা উল্লেখ থাকার কারণে এর এই নামকরণ করা হয়েছে।

আগের ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

সূরা আল ফাতিহার ৫ম আয়াতে সরল সঠিক পথের সন্ধান চাওয়া হয়েছে। আর সূরা আল বাকারাহেই আল্লাহ সঠিক পথের সন্ধান খুঁজার মাধ্যম বলে দিয়েছেন। সূরা বাকারাহের ২য় আয়াতে কুরআনকেই আল্লাহ সরল সঠিক পথ হিসাবে বর্ণনা করেছেন!

এই সূরা (২য় সূরা আল বাকারাহ) এর মূল বিষয় হলো ঈমান, আর পরের ৩য় সূরা আলে ইমরানের মূল বিষয় হলো ঈমানের পরের ধাপ; ইসলাম। এছাড়া আরো অনেক সম্পর্ক রয়েছে।

সূরা বাকারার বৈশিষ্ট্য

সূরা আল-বাকারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে:

- এটি কোরানের দীর্ঘতম সূরা।
- এতে পবিত্র কোরআনের শেষ আয়াত রয়েছে।
- এটি কোরানের দীর্ঘতম আয়াত (ঋণের দায়েরা আয়াত) ধারণ করে।
- এতে রয়েছে কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত (আয়াতুল কুরসি)।
- নবীর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে, এ সূরা কিয়ামতের দিন তার পাঠকের পক্ষে লড়বে, এ সূরাতে রয়েছে ইসমে আজম, তাকে এটি দ্বারা ডাকা হলে তিনি উত্তর দেন এবং এটি আকড়ে ধরা আশীর্বাদ এবং এটি ছেড়ে যাওয়া অনুশোচনা, এবং যাদুকরেরা এটি বহন করতে পারে না।

সূরার ফযিলত

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিও না। যে ঘরে সূরা বাকারাহ পড়া হয় সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়।" [সহিহ মুসলিম ৭৮০]

নাওওয়াস ইবনু সাম'আন (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি কিয়ামতের দিন কুরআন ও কুরআন অনুযায়ী যারা 'আমল করত তাদেরকে আনা হবে। সূরাহ আল বাকারাহ

ও সূরাহ আ-লি ইমরান অগ্রভাগে থাকবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরাহ দুটি সম্পর্কে তিনটি উদাহরণ দিয়েছিলেন যা আমি কখনো ভুলিনি। তিনি বলেছিলেনঃ এ সূরাহ দুটি দু'খণ্ড ছায়াদানকারী মেঘের আকারে অথবা দুটি কালো চাদরের মতো ছায়াদানকারী হিসেবে আসবে যার মধ্যখানে আলোর বলকানি অথবা সারিবদ্ধ দু'ঝাঁক পাখীর আকারে আসবে এবং পাঠকারীদের পক্ষ নিয়ে যুক্তি দিতে থাকবে। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৭৪৬, ইসলামীক সেন্টার ১৭৫৩)

নাওয়াস ইবনে সাম'আন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, “কুরআন ও ইহজগতে তার উপর আমলকারীদেরকে (বিচারের দিন মহান আল্লাহর সামনে) পেশ করা হবে। সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরান তার আগে আগে থাকবে এবং তাদের পাঠকারীদের স্বপক্ষে (প্রভুর সঙ্গে) বাদানুবাদে লিখ্ত হবে। (মুসলিম)

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

২৭৪. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের প্রতিদান তাদের রব-এর নিকট রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

এ আয়াতে ঐ সকল লোকের বিরাট প্রতিদান ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা আল্লাহর পথে ব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা রাতে-দিনে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সবসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, দান-সদকার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নেই, দিনরাতেরও কোন প্রভেদ নেই। এমনিভাবে গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে আল্লাহর পথে ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, খাঁটি নিয়তে দান করতে হবে। নাম-যশের নিয়ত থাকলে চলবে না। প্রকাশ্যে দান করার কোন প্রয়োজন দেখা না দেয়া পর্যন্তই গোপনে দান করার শ্রেষ্ঠত্ব সীমাবদ্ধ। যেখানে এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে প্রকাশ্যে দান করাই শ্রেয়।

যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং যাকে দান করে, তাকে কষ্ট দেয় না, তাদের সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য তাদের কোন বিপদাশংকা নেই এবং অতীতের ব্যাপারেও তাদের কোন চিন্তা নেই।

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

২৭৫. যারা সুদ খায় তারা তার ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এ জন্য যে তারা বলে, ‘ক্রয়-বিক্রয় তো সুদেরই মত। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। অতএব যার নিকট তার রব-এর পক্ষ হতে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, তাহলে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

الربا (সূদ) এর আভিধানিক অর্থ হল, বাড়তি এবং বৃদ্ধি। শরীয়তে সূদ দুই প্রকার; ‘রিবাল ফাফল’ এবং ‘রিবান নাসীয়াহ’। ‘রিবাল ফাফল’ সেই সূদকে বলা হয় যা ছয়টি জিনিসের বিনিময়কালে কমবেশী অথবা নগদ ও ধারের কারণে হয়ে থাকে। (যার বিশদ বর্ণনা হাদীসে আছে।) যেমন, গমের পরিবর্তন যদি গম দ্বারা করা হয়, তাহলে প্রথমতঃ তা সমান সমান হতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ তা নগদ-নগদ হতে হবে। এতে যদি কমবেশী হয় তাও এবং নগদ নগদ না হয়ে যদি একটি নগদ এবং অপরটি ধারে হয় অথবা দু’ টিই যদি ধারে হয় তবুও তা সূদ হবে। আর ‘রিবান নাসীয়াহ’ হল, কাউকে ছয় মাসের জন্য এই শর্তের ভিত্তিতে ১০০ টাকা দেওয়া যে, পরিশোধ করার সময় ১২৫ টাকা দিতে হবে। ছয় মাস পর নেওয়ার কারণে ২৫ টাকা বাড়তি নেওয়া। যাবতীয় রিবাই হারাম।

এখানে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, **আয়াতে সূদ খাওয়ার কথা** বলা হয়েছে। অথচ এর অর্থ হচ্ছে সূদ গ্রহণ করা ও সূদ ব্যবহার করা, খাওয়ার জন্য ব্যবহার করুক, কিংবা পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ী অথবা আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহার করুক। কিন্তু বিষয়টি খাওয়া’ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই যে, যে বস্তু খেয়ে ফেলা হয়, তা আর ফেরত দেয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অন্য রকম ব্যবহারে ফেরত দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পুরোপুরি আত্মসাৎ করার কথা বোঝাতে গিয়ে ‘খেয়ে ফেলা’ শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়। শুধু আরবী ভাষা নয়, অধিকাংশ ভাষার সাধারণ বাকপদ্ধতিও তাই।

আরবরা পাগল ও দেওয়ানাকে বলতো, ‘মজনুন’ (অর্থাৎ জিন বা প্রেতগ্রস্ত)। কোন ব্যক্তি পাগল হয়ে গেছে, একথা বলার প্রয়োজন দেখা দিলে দ্বারা বলতো, উমুককে জিনে ধরেছে। এই প্রবাদটি ব্যবহার করে কুরআন সুদখোরকে এমন এক ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছে যার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তি যেমন ভারসাম্যহীন কথা বলতে ও কাজ করতে শুরু করে, অনুরূপভাবে সুদখোরও টাকার পেছনে পাগলের মতো ছুটে ভারসাম্যহীন কথা ও কাজের মহড়া দেয়। নিজের স্বার্থপর মনোবৃত্তির চাপে পাগলের মতো সে কোন কিছুই পরোয়া করে না। তার সুদখোরীর কারণে কোন্ কোন্ পর্যায় মানবিক প্রেম-প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির শিকড় কেটে গেলো, সামষ্টিক কল্যাণের ওপর কোন ধরনের ধ্বংসকর প্রভাব পড়লো এবং কতগুলো লোকের দুরবস্থার বিনিময়ে সে নিজের প্রাচুর্যের ব্যবস্থা করলো-এসব বিষয়ে তার কোন মাথা ব্যথাই থাকে না। দুনিয়াতে তার এই পাগলপারা অবস্থা। আর যেহেতু মানুষকে আখেরাতে সেই অবস্থায় ওঠানো হবে যে অবস্থায় সে এই দুনিয়ায় মারা গিয়েছিল, তাই কিয়ামতের দিন সুদখোর ব্যক্তি একজন পাগল ও বুদ্ধিভ্রষ্ট লোকের চেহারায় আত্মপ্রকাশ করবে।

এ আয়াতে সুদখোরদের এ শাস্তির কারণ বর্ণিত হয়েছে, তারা দুটি অপরাধ করেছেঃ (এক) সুদের মাধ্যমে হারাম খেয়েছে। (দুই) সুদকে হালাল মনে করেছে এবং যারা একে হারাম বলেছে, তাদের উত্তরে বলেছেঃ ‘ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদেরই অনুরূপ। সুদের মাধ্যমে যেমন মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও মুনাফাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব, সুদ হারাম হলে ক্রয়-বিক্রয়ও তো হারাম হওয়া উচিত’। অথচ কেউ বলে না যে, ক্রয়-বিক্রয় হারাম। এক্ষেত্রে বাহ্যতঃ তাদের বলা উচিত ছিল যে, সুদও তো ক্রয়-বিক্রয়ের মতই। ক্রয়-বিক্রয় যখন হালাল তখন সুদও হালাল হওয়া উচিত। কিন্তু তারা বর্ণনাভঙ্গি পাল্টিয়ে যারা সুদকে হারাম বলত, তাদের প্রতি এক প্রকার উপহাস করেছে যে, তোমরা সুদকে হারাম বললে ক্রয়বিক্রয়কেও হারাম বল।

ব্যবসা ও সুদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণে উভয়ের অর্থনৈতিক ও নৈতিক মর্যাদা একই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। এই পার্থক্য নিম্নরূপঃ

(ক) ব্যবসায়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মুনাফার সমান বিনিময় হয়। কারণ বিক্রেতার কাছ থেকে একটি পণ্য কিনে ক্রেতা তা থেকে মুনাফা অর্জন করে। অন্যদিকে ক্রেতার জন্য ঐ পণ্যটি যোগাড় করার ব্যাপারে বিক্রেতা নিজের যে বুদ্ধি, শ্রম ও সময় ব্যয় করেছিল তার মূল্য গ্রহণ করে। বিপরীতপক্ষে সুদী লেনদেনের ব্যাপারে মুনাফার সমান বিনিময় হয় না। সুদ গ্রহণকারী অর্থের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করে। এটি তার জন্য নিশ্চিতভাবে লাভজনক। কিন্তু অন্যদিকে সুদ প্রদানকারী কেবলমাত্র ‘সময়’ লাভ করে, যার লাভজনক হওয়া নিশ্চিত নয়। নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য যদি সে ঐ ঋণ বাবদ অর্থ গ্রহণ করে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ঐ ‘সময়’ তার জন্যে নিশ্চিতভাবে অলাভজনক ও অনুৎপাদনশীল। আর যদি সে ব্যবসায়ে, শিল্প প্রতিষ্ঠান, কারিগরি সংস্থা অথবা কৃষি কাজে লাগাবার জন্য ঐ অর্থ নিয়ে থাকে, তবুও ‘সময়’ তার জন্যে যেমন লাভ আনবে তেমনি ক্ষতিও আনবে, দু’ টোরাই সম্ভাবনা সমান। কাজেই সুদের ব্যাপারটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় একটি দলের লাভ ও অন্য দলের লোকসানের ওপর অথবা একটি দলের নিশ্চিত ও নির্ধারিত লাভ ও অন্য দলের অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত লাভের ওপর।

(খ) ব্যবসায়ে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে যত বেশী লাভ গ্রহণ করুক না কেন, সে মাত্র একবারই তা গ্রহণ করে। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানকারী নিজের অর্থের জন্য অনবরত মুনাফা নিতে থাকে। আবার সময়ের গতির সাথে সাথে তার মুনাফাও বেড়ে যেতে থাকে। ঋণগ্রহীতা তার অর্থ থেকে যতই লাভবান হোক না কেন তা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু ঋণদাতা এই লাভ থেকে যে মুনাফা অর্জন করে তার কোন সীমা নেই। এমনও হতে পারে, সে ঋণগ্রহীতার সমস্ত উপার্জন, তার সমস্ত অর্থনৈতিক উপকরণ এমনকি তার পরনের কাপড়-চোপড় ও ঘরের বাসন-কোসনও উদরস্থ করে ফেলতে পারে এবং এরপরও তার দাবী অপূর্ণ থেকে যাবে।

(গ) ব্যবসায়ে পণ্যের সাথে তার মূল্যের বিনিময় হবার সাথে সাথেই লেনদেন শেষ হয়ে যায়। এরপর ক্রেতাকে আর কোন জিনিস বিক্রেতার হাতে ফেরত দিতে হয় না। গৃহ, জমি বা মালপত্রের ভাড়ার ব্যাপারে আসল যে বস্তুটি যার ব্যবহারের জন্য মূল্য দিতে হয়, তা ব্যয়িত হয় না বরং অবিকৃত থাকে এবং অবিকৃত অবস্থায় তা ভাড়াদানকারীর কাছে ফেরত দেয়া হয়। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা আসল পুঁজি ব্যয় করে ফেলে তারপর ব্যয়িত অর্থ পুনর্বীর উৎপাদন করে বৃদ্ধি সহকারে ফেরত দেয়।

(ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী ও কৃষিতে মানুষ শ্রম, বুদ্ধি ও সময় ব্যয় করে তার সাহায্যে লাভবান হয়। কিন্তু সুদী কারবারে সে নিছক নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে কোন প্রকার শ্রম ও কষ্ট ছাড়াই অন্যের উপার্জনের সিংহভাগের অংশীদার হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকে “অংশীদার” বলা হয় লাভ-লোকসান উভয় ক্ষেত্রে যে অংশীদার থাকে এবং লাভের ক্ষেত্রে লাভের হার অনুযায়ী যার অংশীদারীত্ব হয়, তেমন অংশীদারের মর্যাদা সে লাভ করে না। বরং সে এমন অংশীদার হয়, যে লাভ-লোকসান ও লাভের হারের কোন পরোয়া না করেই নিজের নির্ধারিত মুনাফার দাবীদার হয়। এসব কারণে ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক মর্যাদা ও সুদের অর্থনৈতিক অবস্থানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সূচিত হয়। এর ফলে ব্যবসায় মানবিক তামাদুনের লালন ও পুনর্গঠনকারী শক্তিতে পরিণত হয়। বিপরীতপক্ষে সুদ তার ধ্বংসের কারণ হয়। আবার নৈতিক দিক দিয়ে সুদের

প্রকৃতিই হচ্ছে, তা ব্যক্তির মধ্যে কার্পণ্য, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, কঠোরতা ও অর্থগৃধুতা সৃষ্টি করে এবং সহানুভূতি ও পারস্পারিক সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব বিনষ্ট করে দেয়। তাই অর্থনৈতিক ও নৈতিক উভয় দিক দিয়েই সুদ মানবতার জন্য ধ্বংস ডেকে আনে।

“যার নিকট তার রব-এর পক্ষ হতে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, তাহলে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।”

একথা বলা হয়নি যে, যা কিছু সে খেয়ে ফেলেছে, আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন। বরং বলা হচ্ছে তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে থাকছে। এই বাক্য থেকে জানা যায়, “যা কিছু সে খেয়েছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই” বাক্যের অর্থ এ নয় যে, যা কিছু ইতিপূর্বে খেয়ে ফেলেছে তা মাফ করে দেয়া হয়েছে বরং এখানে শুধুমাত্র আইনগত সুবিধের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইতিপূর্বে যে সুদ সে খেয়ে ফেলেছে আইনগতভাবে তা ফেরত দেয়ার দাবী করা হবে না। কারণ তা ফেরত দেয়ার দাবী করা হলে মামলা-মোকদ্দমার এমন একটা ধারাবাহিকতা চক্র শুরু হয়ে যাবে যা আর শেষ হবে না। তবে সুদী কারবারের মাধ্যমে যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করেছে নৈতিক দিক দিয়ে তার অপবিত্রতা পূর্ববৎ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি তার মনে যথার্থই আল্লাহর ভীতি স্থান লাভ করে থাকে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তার অর্থনৈতিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যদি সত্যিই পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে নিজেই এই হারাম পথে উপার্জিত ধন-সম্পদ নিজের জন্য ব্যয় করা থেকে বিরত থাকবে এবং যাদের অর্থ-সম্পদ তার কাছে আছে তাদের সন্ধান লাভ করার জন্য নিজস্ব পর্যায়ে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে। হকদারদের সন্ধান পাবার পর তাদের হক ফিরিয়ে দেবে। আর যেসব হকদারের সন্ধান পাবে না তাদের সম্পদগুলো সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার ব্যবস্থা করবে। এই কার্যক্রম তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাতে সাহায্য করবে। তবে যে ব্যক্তি তার পূর্বকার সুদলব্ধ অর্থ যথারীতি ভোগ করতে থাকে, সে যদি তার এই হারাম খাওয়ার শাস্তি লাভ করেই যায়, তাহলে তাতে বিশ্বাসের কিছু নেই।

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

২৭৬. আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ কোন অধিক কুফরকারী, পাপীকে ভালবাসেন না।

এই আয়াতে এমন একটি অকাট্য সত্যের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যেমন সত্য তেমনি অর্থনৈতিক ও তামাদুনিক দিক দিয়েও সত্য। যদিও আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, সুদের মাধ্যমে অর্থ বৃদ্ধি হচ্ছে এবং দান-খয়রাতের মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ কমে যাচ্ছে তবুও আসল ব্যাপার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান হচ্ছে এই যে, সুদ নৈতিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও তামাদুনিক উন্নতির কেবল প্রতিবন্ধকতাই নয় বরং অবনতির সহায়ক। বিপরীতপক্ষে দান-খয়রাতের (করযা-ই-হাসানা বা উত্তম ঋণ) মাধ্যমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি এবং তামাদুন ও অর্থনীতি সবকিছুই উন্নতি ও বিকাশ লাভ করে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বিচার করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সুদ আসলে স্বার্থপরতা, কুপণতা, সংকীর্ণতা, নির্মমতা ইত্যাকার অসৎ গুণাবলীর ফল এবং এই গুণগুলোই সে মানুষের মধ্যে বিকশিত করে। অন্যদিকে দানশীলতা, সহানুভূতি, উদারতা ও মহানুভবতা ইত্যাকার গুণাবলীই দান-খয়রাতের জন্ম দেয় এবং দান-খয়রাতের মাধ্যমে আর নিয়মিত দান-খয়রাত করতে থাকলে এই গুণগুলো মানুষের মধ্যে লালিত ও বিকশিত হতেও থাকে। এমন কে আছে যে,

এই উভয় ধরনের নৈতিক গুণাবলীর মধ্য থেকে প্রথমগুলোকে নিকৃষ্ট ও শেষেরগুলোকে উৎকৃষ্ট বলবে না?তামাদ্দুনিক দিক দিয়ে বিচার করলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিঃসন্দেহে একথা বুঝতে সক্ষম হবে যে, যে সমাজের লোকেরা পরস্পরের সাথে স্বার্থবাদী আচরণ করে, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লাভ ছাড়া নিঃস্বার্থভাবে অন্যের কোন কাজ করে না, একজনের প্রয়োজন ও অভাবকে অন্যজন নিজের মুনাফা লুণ্ঠনের সুযোগ মনে করে তা থেকে পুরোপুরি লাভবান হয় এবং ধনীদের স্বার্থ সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে, সে সমাজ কখনো শক্তিশালী হতে পারে না। সে সমাজের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্কের পরিবর্তে হিংসা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা ও অনাগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। আর বিভিন্ন অংশ হামেশা বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। অন্যান্য কারণগুলো যদি এই অবস্থার সহায়ক হয়ে দাঁড়ায় তাহলে এহেন সমাজের বিভিন্ন অংশের পরস্পরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে যাওয়াটাও মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। অন্যদিকে যে সমাজের সামষ্টিক ব্যবস্থাপনা পরস্পরের প্রতি সাহায্য-সহানুভূতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যার সদস্যরা পরস্পরের সাথে ঔদার্য পূর্ণ আচরণ করে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের প্রয়োজন ও অভাবের সময় আন্তরিকতার সাথে ও প্রশস্ত মনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং একজন সামর্থ্য ও সক্ষম ব্যক্তি তার একজন অক্ষম ও অসামর্থ্য ভাইকে সাহায্য অথবা কমপক্ষে ন্যায়সঙ্গত সহায়তার নীতি অবলম্বন করে, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই পারস্পরিক প্রীতি, কল্যাণাকাংখা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এ ধরনের সমাজের অংশগুলো একটি অন্যটির সাথে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত থাকবে। সেখানে আভ্যন্তরীণ কোন্দল, বিরোধ ও সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার কোন সুযোগই পাবে না। পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সাহায্য সহযোগিতার কারণে সেখানে উন্নতির গতিধারা প্রথম ধরনের সমাজের তুলনায় অনেক বেশী দ্রুত হবে।এবার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করা যাক। অর্থনীতির বিচারে সুদী লেনদেন দুই ধরনের হয়। এক, অভাবীরা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যয়ভার বহন করার জন্য বাধ্য হয়ে যে ঋণগ্রহণ করে। দুই, পেশাদার লোকেরা নিজেদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী, কৃষি ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করার জন্য যে ঋণ গ্রহণ করে। এর মধ্যে প্রথম ধরনের ঋণটি সম্পর্কে সবাই জানে, এর ওপর সুদ আদায় করার পদ্ধতি মারাত্মক ধ্বংসকর। দুনিয়ায় এমন কোন দেশ নেই যেখানে মহাজনরা ও মহাজনী সংস্থাগুলো এই পদ্ধতিতে গরীব, শ্রমিক, মজুর, কৃষক ও স্বল্প আয়ের লোকদের রক্ত চুষে চলছে না। সুদের কারণে এই ধরনের ঋণ আদায় করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বরং অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তারপর এক ঋণ আদায় করার জন্য দ্বিতীয় ঋণ এবং তারপর তৃতীয় ঋণ, এভাবে ঋণের পর ঋণ নিতে থাকে। ঋণের মূল অংকের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী সুদ আদায় করার পরও মূল অংক যেখানকার সেখানেই থেকে যায়। শ্রমিকদের আয়ের বৃহত্তম অংশ মহাজনের পেটে যায়। তার নিজের মাথা ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত অর্থ দিনান্তে তার নিজের ও সন্তান-পরিজনদের পেটের আহার যোগাতে সক্ষম হয় না। এ অবস্থায় কাজের প্রতি শ্রমিক ও কর্মচারীদের আগ্রহ ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে এবং একদিন তা শূন্য পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। কারণ তাদের মেহনতের ফল যদি অন্যেরা নিয়ে যেতে থাকে, তাহলে তারা কোনদিন মন দিয়ে ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে পারে না। তারপর সুদী ঋণের জালে আবদ্ধ লোকেরা সর্বক্ষণ এমন দুর্ভাবনা ও পেরেশানির মধ্যে জীবন কাটায় এবং অভাবের কারণে তাদের জন্য সঠিক খাদ্য ও চিকিৎসা এমনই দুর্লভ হয়ে পড়ে, যার ফলে তাদের স্বাস্থ্য কখনো ভালো থাকে না। প্রায়ই তারা রোগ-পীড়ায় জর্জরিত থাকে। এভাবে সুদী ঋণের নীট ফল এই দাঁড়ায়ঃ গুটিকয় লোক লাখে লোকের রক্ত চুষে মোটা হতে থাকে কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমগ্র জাতির অর্থ উৎপাদন সম্ভাব্য পরিমাণ থেকে অনেক কমে যায়। পরিণামে এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ত চোষারাও নিষ্কৃতি পায় না। কারণ তাদের স্বার্থগৃধুতায় সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীকে বিস্মৃদ্ধ করে তোলে। ধনিক সমাজের বিরুদ্ধে তাদের মনে ক্ষোভ, ঘৃণা ও ক্রোধ লালিত হতে থাকে। তারপর একদিন কোন বিপ্লবের তরংগাভিঘাতে ক্ষোভের আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে। তখন এই জালেম ধনিক সমাজকে

তাদের অর্থ-সম্পদের সাথে সাথে প্রাণ সম্পদও বিসর্জন দিতে হয়। আর দ্বিতীয় ধরনের সুদী ঋণ সম্পর্কে বলা যায়, ব্যবসায় খাটাবার জন্য একটি নির্দিষ্ট সুদের হারে এই ঋণ গ্রহণ করার ফলে যে অসংখ্য ক্ষতি হয় তার মধ্যে উল্লেখ্য কয়েকটি এখানে বিবৃত করছি। একঃ যে কাজটি প্রচলিত সুদের হারের সমান লাভ উৎপাদনে সক্ষম নয়, তা দেশ ও জাতির জন্য যতই প্রয়োজনীয় ও উপকারী হোক না কেন, তাতে খাটাবার জন্য অর্থ পাওয়া যায় না। আবার দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক উপকরণ একযোগে এমন সব কাজের দিকে দৌঁড়ে আসে, যেগুলো বাজারে প্রচলিত সুদের হারের সমান বা তার চাইতে বেশী উৎপাদন করতে পারে, সামগ্রিক দিক দিয়ে তাদের প্রয়োজন বা উপকারী ক্ষমতা অনেক কম অথবা একেবারে শূন্যের কোটায় থাকলেও। দুইঃ ব্যবসায়, শিল্প বা কৃষি সংক্রান্ত যেসব কাজের জন্য সুদে টাকা পাওয়া যায়, তাদের কোন একটিতেও এ ধরনের কোন গ্যারান্টি নেই যে, সবসময় সব অবস্থায় তার মুনাফা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ যেন শতকরা পাঁচ, ছয় বা দশ অথবা তার ওপরে থাকবে এবং এর নীচে কখনো নামবে না। মুনাফার এই হারের গ্যারান্টি তো দূরের থাক সেখানে অবশ্যি মুনাফা হবে, কখনো লোকসান হবে না, এর কোন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই যে ব্যবসায়ে এমন ধরনের পুঁজি খাটানো হয় যাতে পুঁজিপতিকে একটি নির্ধারিত হার অনুযায়ী মুনাফা দেয়ার নিশ্চয়তা দান করা হয়ে থাকে, তা কখনো ক্ষতি ও আশঙ্কা মুক্ত হতে পারে না। তিনঃ যেহেতু মূল ঋণদাতা ব্যবসায়ের লাভ লোকসানে অংশীদার হয় না, কেবলমাত্র মুনাফার অংশীদার হয় এবং তাও আবার একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফার নিশ্চয়তা দেয়ার ভিত্তিতে মূলধন দেয়, তাই ব্যবসায়ের ভালো-মন্দের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ থাকে না। সে চরম স্বার্থপরতা সহকারে কেবলমাত্র নিজের মুনাফার ওপর নজর রাখে। যখনই বাজারে সামান্য মন্দাভাব দেখা দেয়ার আশঙ্কা হয় তখনই সে সবার আগে নিজের টাকাটা টেনে নেয়ার চিন্তা করে। এভাবে কখনো কখনো নিছক তার স্বার্থপরতা সুলভ আশঙ্কার কারণে সত্যি সত্যিই বাজারে মন্দাভাব সৃষ্টি হয়। কখনো অন্য কোন কারণে বাজারে মন্দাভাব সৃষ্টি হয়ে গেলে পুঁজিপতির স্বার্থপরতা তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে চূড়ান্ত ধ্বংসের সূচনা করে। সুদের এ তিনটি ক্ষতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অর্থনীতির সাথে সামান্যতম সম্পর্ক রাখে এমন কোন ব্যক্তি এগুলো অস্বীকার করতে পারবেন না। এরপর একথা মেনে নেয়া ছাড়া গতান্তর নেই যে, যথার্থই সুদ অর্থনৈতিক সম্পদ বাড়ায় না বরং কমায়। এবার দান-খয়রাতের অর্থনৈতিক প্রভাব ও ফলাফলের কথায় আসা যাক। সমাজের সচ্ছল লোকেরা যদি নিজেদের অবস্থা ও মর্যাদা অনুসারে নিঃসংকোচে নিজের ও নিজের পরিবার পরিজনদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নেয় এরপর তাদের কাছে যে পরিমাণ টাকা উদ্ধৃত থাকে তা গরীবদের মধ্যে বিলি করে দেয়, যাতে তারাও নিজেদের প্রয়োজনের জিনিসপত্র কিনতে পারে, তারপরও যে টাকা বাড়তি থেকে যায় তা ব্যবসায়ীদের বিনা সুদে ঋণ দেয় অথবা অংশীদারী নীতির ভিত্তিতে তাদের সাথে লাভ লোকসানের শরীক হয়ে যায় অথবা সমাজ ও সমষ্টির সেবায় বিনিয়োগ করার জন্য সরকারের হাতে সোপর্দ করে দেয়, তাহলে এহেন সমাজে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি চরম উন্নতি লাভ করবে, সমাজের সাধারণ লোকদের সচ্ছলতা বেড়ে যেতে থাকবে এবং সুদী অর্থ ব্যবস্থা ভিত্তিক সমাজের তুলনায় সেখানে সামগ্রিকভাবে অর্থ উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়ে যাবে, একথা যে কেউ সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে সহজেই বুঝতে পারবে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে “আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাফের গোনাহগারকে পছন্দ করেন না”। এতে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা সুদকে হারামই মনে করে না, তারা কুফরে লিপ্ত এবং যারা হারাম মনে করা সত্ত্বেও কার্যতঃ সুদ খায়, তারা গোনাহগার ও পাপাচারী।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

২৭৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যাকাত দিয়েছে, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রব-এর নিকট। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

এই রুকু'তে মহান আল্লাহ বারবার দুই ধরনের লোকদের তুলনা করেছেন। এক ধরনের লোক হচ্ছে, স্বার্থপর, অর্থগ্ধু ও শাইলক প্রকৃতির, তারা আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের অধিকারের পরোয়া না করে টাকা গুনে থাকে, প্রত্যেকটি টাকা গুনে গুনে তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে থাকে এবং সপ্তাহ ও মাসের হিসেবে তা বাড়াবার ও এই বাড়তি টাকার হিসেব রাখার মধ্যে ডুবে থাকে। দ্বিতীয় ধরনের লোক হচ্ছে, আল্লাহর অনুগত, দানশীল ও মানবতার প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা আল্লাহ ও তার বান্দার উভয়ের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি নজর রাখে, নিজেদের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ দিয়ে নিজেদের চাহিদাপূরণ করে এবং অন্যদের চাহিদা পূরণেরও ব্যবস্থা করে। আর এই সঙ্গে নিজেদের অর্থ ব্যাপকভাবে সৎকাজে ব্যয় করে। প্রথম ধরনের লোকদেরকে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। এই ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোকদের সাহায্যে দুনিয়ায় কোন সৎ ও সুস্থ সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। আখেরাতেও তারা দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা ও বিপদ-মুসিবত ছাড়া আর কিছুই পাবে না। বিপরীতপক্ষে দ্বিতীয় ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোকদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন। তাদের সাহায্যেই দুনিয়ায় সৎ ও সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে এবং আখেরাতে তারাই কল্যাণ ও সাফল্যের অধিকারী হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

২৭৮. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁকে ভয় করে ও ঐ কার্যাবলী হতে বিরত থাকে যেসব কার্যে তিনি অসন্তুষ্ট। তাই তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি সদা লক্ষ্য রাখ, প্রতিটি কাজে তাঁকে ভয় করে চল এবং মুসলমানদের উপর তোমাদের যে সুদ অবশিষ্ট রয়েছে, সাবধান! যদি তোমরা মুসলমান হও তবে তা নিও না! কেননা এখন তা হারাম হয়ে গেছে। সাকীফ গোত্রের বানু আমর বিন উমায়ের ও বানু মাখযুম গোত্রের বানু মুগীরার সম্বন্ধে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অজ্ঞতার যুগে তাদের মধ্যে সুদের কারবার ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর বানু আমর বানু মুগীরার নিকট সুদ চাইতে থাকে। তারা বলেঃ ইসলাম গ্রহণের পর আমরা তা দিতে পারি না। অবশেষে তাদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায়। মক্কার প্রতিনিধি হযরত আব্বাস বিন উসায়দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এই সম্বন্ধে পত্র লিখেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটা লিখে পাঠিয়ে দেন এবং তাদের জন্য সুদ গ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করেন। ফলে বানু আমর তাওবা করতঃ তাদের সুদ সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেয়। এই আয়াতে ঐ লোকদের ভীষণভাবে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যারা সুদের অবৈধতা জেনে নেয়া সত্ত্বেও ওর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

২৭৯. অতঃপর যদি তোমরা না কর তবে আল্লাহ ও তার রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও। আর যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা যুলুম করবে না এবং তোমাদের উপরও যুলুম করা হবে না।

যদি তোমরা না কর তবে আল্লাহ ও তার রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও-আলোচ্য আয়াতে এ নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে কঠোর শাস্তির কথা শোনানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি সুদ পরিহার না কর, তবে আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। কুফর ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তম গোনাহর কারণে কুরআনুল কারীমে এত বড় শাস্তির কথা আর উচ্চারিত হয়নি। [মাআরিফুল কুরআন]

বলা হয়েছে ‘যদি তোমরা তাওবা করে ভবিষ্যতের জন্য বকেয়া সুদ ছেড়ে দিতে সংকল্পবদ্ধ হও, তবে তোমরা আসল মূলধন ফেরত পেয়ে যাবে’। মূলধনের অতিরিক্ত আদায় করে তোমরা কারো উপর যুলুম করতে পার না এবং কেউ মূলধন হ্রাস করে কিংবা পরিশোধে বিলম্ব করে তোমাদের উপরও যুলুম করতে পারবে না। আয়াতে মূলধন দেয়াকে তাওবার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি তোমরা তাওবা কর এবং ভবিষ্যতে সুদ ছেড়ে দিতে সংকল্পবদ্ধ হও, তবেই তোমরা মূলধন ফেরত পাবে। এ থেকে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, সুদ ছেড়ে দেয়ার সংকল্প করে তাওবা না করলে মূলধনও ফেরত পাবে না। সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি সুদের অর্থ অর্জন করেছিল, সুদ হারাম হওয়ার পর সে যদি ভবিষ্যতের জন্য তাওবা করে নেয় এবং সুদ থেকে বিরত থাকে, তবে পূর্বকার সঞ্চিত অর্থ শরীআতের নির্দেশ অনুযায়ী তারই অধিকারভুক্ত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, সে সর্বান্তকরণেই বিরত রয়েছে কি কপটতা সহকারে তাওবা করেছে - তার এ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারটি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল থাকবে।

তোমরা যুলুম করবে না এবং তোমাদের উপরও যুলুম করা হবে না- এ প্রসঙ্গে প্রথমে বোঝা দরকার যে, জগতের কোন সৃষ্টবস্তু ও তার কাজ-কারবারই এমন নেই যাতে কোন না কোন বৈশিষ্ট্য বা উপকারিতা নেই। সাপ-বিছুর, বাঘ-সিংহ এমনকি সংখিয়ার মত মারাত্মক বিষের মধ্যেও মানুষের হাজারো উপকারিতা নিহিত রয়েছে। চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ঘুষ ইত্যাদির মধ্যেও কোন না কোন উপকার খুঁজে বের করা কঠিন নয়। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম ও জাতির চিন্তাশীল শ্রেণীর মধ্যেই দেখা যায়, যে জিনিষের মধ্যে উপকার বেশী এবং ক্ষতি কম, তাকে উপকারী ও উত্তম মনে করা হয়। পক্ষান্তরে যেসব জিনিষের অনিষ্ট ও অপকারিতা বেশী এবং উপকারিতা কম, সেগুলোকে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়। রিবা’ অর্থাৎ সুদের অবস্থাও তদ্রূপ। এতে সুদখোরের সাময়িক উপকার অবশ্যই দেখা যায়। কিন্তু এর দুনিয়া ও আখেরাতের মন্দ পরিণাম এ উপকারের তুলনায় অত্যন্ত জঘন্য। প্রত্যেক বস্তুর উপকার-অপকার ও লাভ-ক্ষতি তুলনা করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কাছে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় হয়ে থাকে যে, যদি কোন বস্তুর উপকার অস্থায়ী ও সাময়িক হয় এবং অপকার দীর্ঘস্থায়ী কিংবা চিরস্থায়ী হয়, তবে একে কোন বুদ্ধিমান উপকারী বস্তুসমূহের তালিকায় গণ্য করতে পারে না। এমনিভাবে যদি কোন বস্তুর উপকার ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয় এবং ক্ষতি সমগ্র জাতির ঘাড়ে চাপে, তবে একেও কোন সচেতন মানুষ উপকারী বলতে পারে না। চুরি ও ডাকাতিতে চোর ও ডাকাতের উপকার অনস্বীকার্য। কিন্তু তা সমগ্র জাতির জন্য ক্ষতিকর এবং তাদের শান্তি ও স্বস্তি বিনষ্টকারী। তাই কোন মানুষই চুরি-ডাকাতিতে ভাল বলে না। সুতরাং সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, সুদখোরের সাময়িক ও অস্থায়ী উপকারের তুলনায় তার আত্মিক ও নৈতিক ক্ষতি এত তীব্র যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি মানবতার গণ্ডির ভেতরেই থাকতে পারে না। তার সাময়িক উপকারটিও শুধুমাত্র তার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত উপকার। কিন্তু এর ফলে গোটা জাতিকে বিরাট ক্ষতি ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার স্বীকার হতে হয়।

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

২৮০. আর যদি সে অভাবগ্রস্ত হয় তবে স্বচ্ছলতা পর্যন্ত তার অবকাশ। আর যদি তোমরা সদকা কর তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।

এ আয়াতে সুদখুরীর মানবতা বিরোধী কাণ্ডকীর্তির বিপরীতে পবিত্র চরিত্র এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি কৃপামূলক ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমার খাতক যদি রিজ্ত হস্ত হয় - ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হয়, তবে শরীআতের নির্দেশ এই যে, তাকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া বিধেয় যদি তাকে ঋণ থেকেই রেহাই দিয়ে দাও, তবে তা তোমার জন্য আরও উত্তম। সুদখোরদের অভ্যাস এই যে, খাতক নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধে সক্ষম ন। হলে সুদের অংক আসলের সাথে যোগ করে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারবার চালায় এবং সুদের হারও আগের চাইতে বাড়িয়ে দেয়। এখানে শ্রেষ্ঠতম বিচারক আল্লাহ তা'আলা আইন প্রণয়ন করে দিয়েছেন যে, কোন খাতক বাস্তবিকই নিঃস্ব হলে এবং ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তাকে অতিষ্ঠ করা জায়েয নয়; বরং তাকে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। সাথে সাথে এ ব্যাপারেও উৎসাহিত করেছেন যে, যদি এ গরীবকে ক্ষমা করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম। এখানে ক্ষমা করাকে কুরআনুল কারীম সদকা শব্দে ব্যক্ত করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ ক্ষমা তোমার জন্য সদকা হয়ে যাবে এবং বিরীট সওয়াবের কারণ হবে। এছাড়াও আরও বলেছেনঃ ক্ষমা করা তোমাদের জন্য উত্তম। হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পূর্বের যামানায় এক ব্যক্তি লোকদেরকে ঋণ দিত আর তার সন্তানদেরকে বলত যে, যখন কোন বিপদগ্রস্ত লোক আসে তখন তার কর্জ ক্ষমা করে দিও। হয়তো আল্লাহও আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। তিনি বলেনঃ অতঃপর (লোকটি মৃত্যুর পর) আল্লাহর সাক্ষাত পেল, তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। [বুখারীঃ ৩৪৮০] অন্য এক হাদীসে এসেছেঃ “যে কেউ অভাবীকে অবকাশ দিবে তার জন্য কর্জ পরিশোধের সময় পর্যন্ত প্রতিদিন সদকার সওয়াব লেখা হবে। তারপর যদি আবার তাকে নতুন করে কর্জ পরিশোধের অবকাশ দেয় তবে কর্জ আদায় করার সময় পর্যন্ত প্রতিদিন তার সদকার সওয়াব লেখা হবে। [মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/২৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৬০]

এ আয়াত থেকে শরীআতের এ বিধান গৃহীত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে, ইসলামী আদালত তার ঋণদাতাদের বাধ্য করবে যাতে তারা তাকে সময় দেয় এবং কোন কোন অবস্থায় আদালত তার সমস্ত দেনা বা তার আংশিক মাফ করে দেয়ারও ব্যবস্থা করবে। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন হাদীস এসেছে।

সূরা আল-বাকারার ২৭৫ থেকে ২৮০ এ ছয়টি আয়াতে সুদের অবৈধতা ও বিধিবিধান বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যে সুদখোরদের মন্দ পরিণতি এবং হাশরের ময়দানে তাদের লাঞ্ছনার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা সুদ খায়, তারা দণ্ডায়মান হয় না; কিন্তু সে ব্যক্তির মত, যাকে কোন শয়তান জিন আসর করে দিশেহারা করে দেয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ হাশরের ময়দানে কবর থেকে উঠা। সুদখোর যখন কবর থেকে উঠবে, তখন ঐ পাগল বা উন্মাদের মত উঠবে, যাকে কোন শয়তান জিন দিশেহারা করে দেয়। [ইমাম ত্বাবারী সহীহ সনদে তার তাফসীরে বর্ণনা করেন।]

তাছাড়া সুদখোরের শাস্তি ও ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আরও অনেক হাদীস এসেছে, যেমন: (১) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোরকে লা'নত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ যে সুদ খায়, আর যে খাওয়ায়, আর যে লিখে এবং সুদের কর্মকাণ্ডের দুই সাক্ষী, তাদের প্রত্যেকের উপর আল্লাহর লা'নত হোক। [ইবনে মাজাহঃ ২২৭৭]

(২) আবু যুহাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য, ঘিনার ব্যবসা থেকে নিষেধ করেছেন এবং সুদ দাতা, গ্রহীতা, শরীর খোদাই করে নকশা করা, যে করায়, যে ছবি অংকন করে, এদের সবার উপর লা'নত করেছেন। [বুখারীঃ ৫৯৬২] (৩) সামূরা ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময়ই তার সাথীদের জিজ্ঞেস করতেনঃ তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? কেউ কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে, সে তার নিকট বলত যা আল্লাহ চাইতেন। একদিন সকালে তিনি বললেনঃ রাতে (স্বপ্নে) আমার নিকট দু'জন আগন্তুক (ফেরেশতা) আসল। আমাকে তারা উঠাল। তারপর আমাকে বললঃ চলুন। আমি তাদের দু' জনের সাথে চললাম। ... সামনে অগ্রসর হয়ে আমরা একটি নদীর নিকট পৌঁছলাম। ... সে নদীতে একজনকে সাতরাতে দেখলাম। নদীর পাড়ে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। যার নিকট ছিল অসংখ্য পাথরের এক স্তূপ। সাতারকারী লোকটি সাতরানো শেষ করে যার নিকট পাথরের স্তূপ ছিল তার নিকট এসে মুখ খুলে দিত। আর সে তার মুখে একটি করে পাথর নিক্ষেপ করত। তারপর সে সাতরাতে চলে যেত। সাতরিয়ে ফিরে এসে আবার অনুরূপ মুখ খুলে দিত। আর ঐ লোকটি তার মুখে একটি করে পাথর নিক্ষেপ করত। শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিবরীল বললেনঃ আর যে লোক ঋণীয়া সাতরাচ্ছিল, যার নিকট দিয়ে আপনি গিয়েছিলেন, যে পাথরের লোকমা খাচ্ছিল, সে ছিল সুদখোর। [বুখারীঃ ৩৪৮০]

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

২৮১. আর তোমরা সেই দিনের তাকওয়া অবলম্বন কর যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। তারপর প্রত্যেককে সে যা অর্জন করেছে তা পুরোপুরি প্রদান করা হবে। আর তাদের যুলুম করা হবে না।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে নসীহত করে বলছেন যে, দুনিয়ার আবাস ক্ষণস্থায়ী। এখান থেকে খুব কম সময়ের পরই তোমাদেরকে চলে যেতে হবে। এখানকার যাবতীয় সম্পদ রেখেই সবাইকে খালি হাতে আমার সামনে আসতে হবে। সুতরাং সে দিনের ব্যাপারে সদা সতর্ক ও সাবধান থাকা জরুরী যখন তোমরা আমার সামনে নীত হবে। সেদিন তোমাদের কৃতকর্ম অনুসারে তোমাদেরকে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়া হবে। সায়ীদ ইবনে জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ আয়াত সবশেষে নাযিল হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৯ দিন জীবিত ছিলেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু মতে এর পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র ৩১ দিন জীবিত ছিলেন

ফুটনোট

- রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করা যাবে।
- সুদখোরদের ভয়ানক পরিণতি বিশেষ করে যারা সুদ হারাম হবার কথা জানার পরেও বিরত থাকবে না।
- সুদ দুই প্রকার; ‘রিবাল ফাফল’ এবং ‘রিবান নাসীয়াহ’ ।
- সুদে সম্পদ বৃদ্ধি হয় না।
- ‘ব্যবসা তো সুদের মতই। এই রকম একটা ভূয়া যুক্তি জাহিলী যুগে সুদখোরা দিতো বর্তমান যুগেও কিছু মানুষ দিয়ে থাকে। তথচ দুইটার মধ্যে নৈতিক ও অর্থিক বিশাল তফাৎ রয়েছে।
- সুদখোরা দুটি অপরাধ করেছেঃ (এক) সুদের মাধ্যমে হারাম খেয়েছে। (দুই) সুদকে হালাল মনে করেছে এবং যারা একে হারাম বলেছে, তাদের উত্তরে বলেছেঃ ‘ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদেরই অনুরূপ।
- সুদ খেয়ে থাকলে তা থেকে তাওবাহ করা আবশ্যিক। যে ব্যক্তি তাওবাহ করবে সে মূলধন পাবে।
- আখিরাতকে ভয় করে শরীয়ত গর্হিত সকল কর্ম বর্জন করা উচিত, কারণ আখিরাতের অবস্থা বড় কঠিন।
- ঈমানদারদের কোন ভয় নেই চিন্তিত হওয়ার কারণও নেই। ঈমানদারদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।
- আল্লাহ সুদকে নিশিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন।